তারিখ 04 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৫

এইসব মেধাবী ছাত্র–ছাত্রী ভর্তি হবে কোথায়?

ঢাকা ও কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। দু'এক দিনের মধ্যে রাজশাহী ও যশোর বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে। এসএসসি পরীক্ষায় গত বছরের মত এবারও পাসের হার গড়পড়তা ৬০ শতাংশ। এখনও ৪০ শতাংশ ছাত্র–ছাত্রী পাসের মুখ দেখতে পারছে না। নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক পরীক্ষার নম্বর এক করে পাসের ব্যবস্থা করায় প্রশ্ন ব্যাংকের বদৌলতে গত বছর থেকেই পাসের হার যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে প্রথম বিভাগপ্রাপ্ত ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা। এক সময় প্রথম বিভাগপ্রাপ্ত ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত। কিন্তু বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিতে এখন দ্বিতীয়–তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। এখন বেশীরভাগ ছাত্র–ছাত্রীই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়। স্টার মার্কস পাওয়া এক সময় বিরাট খবর ছিল, এখন হাজার ছাত্র–ছাত্রী স্টার মার্কস নিয়ে পাস করে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এরকম চমৎকার রেজাল্ট নিয়ে এইসব ছাত্র–ছাত্রী ভর্তি হবে কোথায়?

গত বছর এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৫,২২,১৭৪ জন ছাত্র–ছাত্রী। তার মধ্যে গড়ে ৬০ শতাংশের মত পাস করলেও পাস করা ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল তিন লাখেরও বেশী। ১৯৯১ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৪,৭৫,২৬১ জন ছাত্র–ছাত্রী। তার মধ্যে কৃতকার্য হয়েছিল ৩,০৮,৬৭৬ জন ছাত্র–ছাত্রী। ১৯৯৩ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৬,৭৬,১৩৯ জন পরীক্ষার্থী। এদের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন লাখ ছাত্র–ছাত্রী উত্তীর্ণ হবে বলে আশা করা যায়। এদের বেশীর ভাগেরই আবার রেজাল্ট ভাল– স্টার মার্কস, লেটার, প্রথম বিভাগ।

কিন্তু এদের সকলের জন্য প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে– এরা ভর্তি হবে কোথায়?

মাধ্যমিক তথা এসএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার মত স্কুলের সংখ্যা সারা দেশে ৮,৭১৫টি। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে পড়বার মত কলেজের সংখ্যা ১৯৯১ সালে ছিল ৩২৩টি মাত্র। এই ৩২৩টি কলেজে কি সাড়ে তিন লক্ষ ছাত্র–ছাত্রীর ধারণ ক্ষমতা আছে? সম্ভব কি পাস করা সকল ছাত্র–ছাত্রীকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি করা?

১৯৯১ সালের হিসাব থেকে দেখা যায়, ওই বছর সারা দেশ থেকে মোট ৩,০৮,৬৭৬ জন ছাত্র–ছাত্রী পাস করলেও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল মাত্র ২,৬১,৩০৮ জন ছাত্র–ছাত্রী। তাদের মধ্যে পাস করেছিল ১,৩২,৬১৯ জন। অর্থাৎ এসএসসিতে যারা পাস করেছিল তাদের মাত্র এক–তৃতীয়াংশ উত্তীর্ণ হয়েছিল এইচএসসি পরীক্ষায়। এই এক লাখ ৩২ হাজার ছাত্র–ছাত্রীর মধ্যে সামান্য অংশই বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পেয়েছিল। বাকীরা ধাপে ধাপে ঝরে গেছে। ভর্তির সুযোগ পায়নি, পায়নি উচ্চ শিক্ষার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে।

আসলে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই আমাদের ছাত্র–ছাত্রীদের এই ঝরে যাবার ধারা সৃষ্টি হয়। ১৯৯১ সালে প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হয়েছিল ৫৩ লক্ষ ৬৫ হাজার ৩১৬ জন ছাত্র–ছাত্রী। কিন্তু তার মধ্যে মাত্র ৩১ লক্ষ ছাত্র–ছাত্রী ভর্তি হয়েছিল নিম্নমাধ্যমিক শ্রেণীতে। কিন্তু তার চেয়েও যা বিস্ময়কর তা হল এই ৩১ লক্ষ ছাত্র–ছাত্রীর মধ্যে সাড়ে ৪ লাখ ছাত্র–ছাত্রী শেষ পর্যন্ত এসএসসি পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিল।

এই অবস্থা থেকেই দেশের সামগ্রিক শিক্ষার একটি চিত্র পাওয়া যায়। যদিও দেশে তুলনামূলকভাবে সাক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত বছরের তুলনায় এ বছর ৩·৫ শতাংশ সাক্ষরতা বেড়েছে। কিন্তু সামগ্রিক চিত্রে যে তাতে খুব একটা হেরফের হবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই।

শিক্ষা ক্ষেত্রে শুধু ভর্তিই তো শেষ কথা নয়। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে দীর্ঘদিন ধরে শহরের কয়েকটি নির্দিষ্ট স্কুলই বরাবর ভাল ফল করছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আমাদের অভিনন্দন। এবারও কোন কোন স্কুল খুব ভাল ফল করেছে। মেধা তালিকার পুরোটা জুড়ে তাদের নাম। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, গ্রাম–গঞ্জের স্কুলের অবস্থা তথৈবচ। আগেও যেমন তারা কখন তেমন একটা ভাল ফল করতে পারেনি, এবারও সে রকমই অবস্থা। শহরের ভাল স্কুলগুলোতে কোন দ্বিতীয় বিভাগ/তৃতীয় বিভাগ নেই। সকলেই প্রথম বিভাগ পেয়েছে, স্টার, লেটার পেয়েছে অসংখ্য ছাত্র–ছাত্রী। কিন্তু যারা ফেল করেছে, যারা দ্বিতীয়/তৃতীয় বিভাগ পেয়ে কোনমতে পাস করেছে, তার সবই খারাপ স্কুল। ফেলের সংখ্যাও গ্রামের স্কুলেই বেশী। এর ফলে গ্রামের স্কুল থেকে পাস করা ছাত্র–ছাত্রীরা ভাল কলেজে ভর্তি হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। পিছিয়ে–পড়া এই ছাত্র–ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষার দ্বার পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।

গত বছর থেকেই একটা বিষয় লক্ষ্যনীয় হয়েছে যে, বহু ভাল কলেজ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির জন্য শুধু স্টারপ্রাপ্তদের কাছ থেকে দরখাস্ত নিয়েছে। এসব ভাল কলেজের এক একটির এক নিয়ম। কেউ বিজ্ঞপ্তি টানিয়েছে, ৮০০'র নিচে যাদের নম্বর তারা আবেদন করতে পারবে না। উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তির এই ভাল ছাত্রদের মধ্যে আবার লিখিত, মৌখিক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে আসন সংখ্যা অনুযায়ী যাচাই করে নেয়া হয়েছে ছাত্র–ছাত্রী। ফলে পরের বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় এইসব কলেজ যে ভাল করবে, সে কথা নিঃসংশয়েই বলা যায়।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, শিক্ষার গোটা ব্যবস্থাই এখন এক বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে। শহরে ভাল স্কুলে প্রথম বা তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তির জন্য কোচিং–এর আয়োজন, বৃত্তি পরীক্ষা দিতে কোচিং–এর আয়োজন, এসএসসি পরীক্ষা দিতে কোচিং বা প্রাইভেট টিউটরের আয়োজন। এসএসসি পরীক্ষায় ভাল করতে আবার প্রতি বিষয়ে চাই এক একজন টিউটর। ফল ভাল করতে চাইলে টিউটরের প্রয়োজন আর টিউটর পিছু প্রায় হাজার টাকার মামলা। এই সমাজে কতজন অভিভাবকের ক্ষমতা আছে সন্তান পিছু মাসে ৮/১০ হাজার টাকা খরচ করার? যারা সেই সাধ্য রাখেন, তাদের সন্তানরা পরীক্ষায় ভাল করে, ভাল স্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ পায়, ভাল কলেজে ভর্তি হবার সুযোগ পায়, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার সুযোগ পায় এবং শেষ পর্যন্ত সমাজের কর্ণধার হবার অধিকার অর্জন করে।

কিছুদিন আগে প্রকাশিত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের এক জরিপ রিপোর্ট থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কর্মকমিশনের ১৯৯২ সালের বার্ষিক রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯৮৫ সালেও কৃষক পরিবারের সন্তানেরা যেখানে সরকারী চাকরির ৩৩ ভাগে নিয়োজিত হত, ১৯৯০–৯১ সালে এসে তা দাঁড়িয়েছে শতকরা ২৫ ভাগে। অথচ দেশে কৃষকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগ।

শিক্ষার বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে পল্লী এলাকার সাধারণ মানুষ যে এক সময় দেশের প্রশাসন থেকে মুছে যাবে, তা বোধকরি নিশ্চিত করেই বলা যায়। এই ধারায় যত দ্রুত সম্ভব পরিবর্তন আনা দরকার। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এবং শহরের খারাপ স্কুলগুলোতেও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে শিক্ষার মান ভাল করার ব্যবস্থা নিতে হবে, নিতে হবে দক্ষ শিক্ষকও।

তবে এই যে বিপুল সংখ্যক ছাত্র–ছাত্রী প্রথম বিভাগ নিয়ে কিংবা স্টার মার্কস নিয়ে পরীক্ষায় পাস করল, ভাল ছাত্র হিসাবে অভিভাবকদের মুখ উজ্জ্বল করল, তারা সবাই কি প্রকৃতপক্ষেই উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করেছে? আমরা তাদের কৃতিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলছি না। কিন্তু পরীক্ষা পদ্ধতির যে গলদের মধ্য দিয়ে প্রকৃত শিক্ষা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে– তাও দূর করার কার্যকর উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

আমরা বলতে চাই, প্রকৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে এখন প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রশ্ন ব্যাংক। এই প্রশ্ন ব্যাংক তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সরকার। কিন্তু ছাত্র–ছাত্রী ও কিছু সংখ্যক শিক্ষকের প্ররোচনার মুখে সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। তাছাড়া নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক প্রশ্নের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে পাস করার যে ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছিল, তাও বাতিল করা হয়। ফলে রচনামূলক পরীক্ষা যা দিয়ে মেধার যাচাই সম্ভব—অংশে একটি প্রশ্নের জবাব না দিয়েও যে–কোন ছাত্র উচ্চতর দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস করতে পারে। এই ব্যবস্থা আসলে প্রকৃত শিক্ষার পথে, মেধা যাচাইয়ের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সরকার ১৯৯৬ সাল থেকে প্রশ্নব্যাংক ব্যবস্থা তুলে নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একই সঙ্গে ১৯৯৬ সাল থেকেই নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক পরীক্ষায় আলাদা আলাদাভাবে পাস করার বিধান প্রচলন করতে যাচ্ছেন। এই ব্যবস্থা কার্যকর হলে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকৃতই মেধা যাচাই সম্ভব হবে।

কিন্তু মেধা যাচাই তো পরের কথা। মেধার বিকাশের ব্যবস্থাই শুরুর কথা। তার জন্য শিক্ষাঙ্গনে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সে দায়িত্বের বেশীর ভাগ বর্তায় শিক্ষক–শিক্ষিকার ওপর। তাছাড়া উপযুক্ত শিক্ষা উপকরণের সরবরাহও নিশ্চিত করা দরকার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। সেই উদ্যোগে সরকারেরও বড় ভূমিকা রয়েছে। স্টার–লেটার–প্রথম শ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ, সন্দেহ নেই– কিন্তু তারচেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠা এবং প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা।

— রেজোয়ান সিদ্দিকী